মুহার্রামের কর্তব্যাকর্তব্য

আব্দুল হামীদ মাদানী

এ কথা বিদিত যে, হুসাইন ﵁-এর ১০ই মুহার্রামের দিনে শহীদ হওয়ার সাথে আশূরার রোযার নিকট অথবা দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। কারণ, তার পূর্বে মহানবী ﷺ; বরং তাঁর পূর্বে মূসা নবী ﵇ এই দিনে রোযা রেখে গেছেন। আর এই দিনে শিয়া সম্প্রদায় যে মাতম ও শোক পালন, মুখ ও বুক চিরে, গালে থাপ্পড় মেরে, চুল-জামা ছিঁড়ে, পিঠে চাবুক মেরে আত্মপ্রহার ইত্যাদি করে থাকে, তা জঘন্যতম বিদআত। সুন্নাহতে এ সবের কোন ভিত্তি নেই।

পরন্তু মৃতব্যক্তির জন্য মাতম করা বৈধ নয়। এ প্রসঙ্গে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যার কিছু নিম্নরূপ ঃ-

আবূ হুরাইরা ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মানুষের মাঝে দুটি কর্ম এমন রয়েছে যা কুফরী (কাফেরদের কাজ)। (প্রথমটি হল,) বংশে খোঁটা দেওয়া এবং (দ্বিতীয়টি হল,) মৃতের জন্য মাতম করা।" *(মুসলিম ৬৭নং)*

হযরত আবূ মালেক আশআরী ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আমার উম্মতের মাঝে চারটি কাজ হল জাহেলিয়াতের প্রথা, যা তারা ত্যাগ করবে না; বংশ নিয়ে গর্ব করা, (কারো) বংশ-সূত্রে খোঁটা দেওয়া, তারা (ও নক্ষত্রের) মাধ্যমে বৃষ্টির আশা করা এবং (মুর্দার জন্য) মাতম করা।"

আসলে বিলাপ ও মাতম করে কান্না করা মহিলাদের অভ্যাস। তাই রসূল ﷺ মহিলাদের জন্য বলেছেন, "আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসিনী কোন কোন মহিলার জন্য কোন মৃতের উপর তিন দিনের অধিক শোক পালন করা হালাল নয়। তবে মৃত স্বামী হলে তার উপর ৪ মাস ১০ দিন শোক পালন করবে।" *(বুখারী ১২০১ক, মুসলিম ২৭৩০ ক, প্রমুখ)*

তিনি আরো বলেন, "মাতমকারিণী মহিলা যদি মৃত্যুর পূর্বে তওবা না করে মারা যায়, তাহলে কিয়ামতের দিনে তাকে গলিত (উত্তপ্ত) তামার পায়জামা (শেলোয়ার) ও চুলকানিদার (অথবা দোযখের আগুনের তৈরী) কামীস পরা অবস্থায় পুনরুত্থিত করা হবে।" *(মুসলিম ৯৩৪, ইবনে মাজাহ ১৫৮১নং)*

হযরত ইবনে মাসঊদ ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি (বিপদে অধৈর্য হয়ে অথবা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে) গালে চাপড় মারে গলা ও বুকের কাপড় ফাড়ে এবং জাহেলী যুগের (লোকেদের) মত ডাক ছেড়ে মাতম করে!" *(বুখারী ১২৯৪, ২১৯৭, মুসলিম ১০৩, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ১৫৮৪নং, আহমাদ, ইবনে হিব্বান)*

হযরত আবূ বুরদাহ ﵁ বলেন, (আমার পিতা) আবূ মূসা আশআরী একদা অসুখের যন্ত্রণায় মূর্ছা গেলেন। সে সময় তাঁর এক পরিবারের কোলে তাঁর মাথা রাখা ছিল। সে তখন সুর ধরে চিৎকার করে কান্না শুরু করে দিল। সে অবস্থায় আবূ মূসা তাকে বাধা দিতে অক্ষম ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি পূর্ণ জ্ঞান ফিরে পেলেন তখন বললেন, 'সেই লোকের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, যে লোক হতে আল্লাহর রসূল ﷺ সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করেছেন। আল্লাহর রসূল ﷺ সে মহিলা হতে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করেছেন, যে (বিপদে অধৈর্য হয়ে অথবা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে) উচ্চরবে বিলাপ করে, মাতম করে, মাথার কেশ মুন্ডন করে এবং নিজের পরিহিত কাপড় ছেঁড়ে। *(বুখারী কাটা সনদে ১২৯৬নং, মুসলিম ১০৪, ইবনে মাজাহ ১৫৮৬নং, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান)*

মাতম করা বা মৃত্যুবার্ষিকী পালন ক'রে শোকপালন করা শরীয়তে বৈধ নয়; না হযরত হুসাইনের জন্য, আর না-ই তাঁর থেকে বড় কোন সাহাবী অথবা কোন নবীর জন্য। কেবল শহীদদের জন্য হলেও আপনি কাকে ছেড়ে কার কত শোক পালন করবেন? প্রায় দিনই তো কেউ না কেউ শহীদ হয়েছেন।

আশূরার দিন 'মহর্রম' পরব মানাতে গিয়ে কিছু মুসলমান তাযিয়া বানিয়ে থাকে। হযরত হুসাইনের নকল কবর বানিয়ে তা রথের মত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরানো হয় এবং নিয়ে যাওয়া হয় নকল কারবালার ময়দানে। আর সেই সঙ্গে ঢাক-ঢোল, বাজনা-বাঁশি, শির্কী ও বিদআতী মর্সিয়া সহ মাতম করা হয়, তলোয়ার ও লাঠি খেলা হয়, আত্মপ্রহার করা হয়, মদ খেয়ে নাচা হয় ও আমোদ-ফূর্তি করা হয়।

দলে দলে যিয়ারত করা হয় সেই নকল কবরের, সিজদা করা হয়, সেখানে নযর মানা ও পূরণ করা হয়। আর এ সব যে ইসলামী শরীয়তে হারাম তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এ ছাড়া কোন কোন সম্প্রদায় নিশানা বের করে মর্সিয়া (শোকগাথা) গেয়ে বেড়ায়। যে মর্সিয়াতে সাহাবী মুআবিয়া ﵁ ও তাঁর ছেলে ইয়াযীদকে গালাগালি করা হয়, কাফের বলা হয়, ইত্যাদি।

অথচ আমাদের শরীয়ত আমাদেরকে বলে, "তোমরা মৃতদেরকে গালি দিও না। যেহেতু তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করছে।" *(বুখারী)*

"তোমরা মৃতদেরকে গালি দিয়ে জীবিতদেরকে কষ্ট দিও না।" *(সহীহ তিরমিযী ২/১৯০)*

কাউকে কাফের বলাও সহজ ব্যাপার নয়। যেহেতু তাতে নিজের ক্ষতি নিজে করা হয়। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন,

"যে ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভাইকে 'কাফের' বলে তাদের উভয়ের একজনের উপর তা বর্তায়।" *(বুখারী ও মুসলিম)* "যদি সে কাফের হয় যেমন সে বলে; নচেৎ তা তারই উপর ফিরে আসে।" *(মুসলিম)*

"কোন ব্যক্তি যখন অপর ব্যক্তিকে কাফের বা ফাসেক বলে অভিহিত করে, তখন তা তারই উপর ফিরে আসে যদি অপর ব্যক্তি তা না হয়।" *(বুখারী)*

খানা-পানি দান করা ভালো জিনিস হলেও ঐ দিনে দান করা ভালো বলে কোন দলীল নেই। আর সেই জন্য নির্দিষ্ট ক'রে ঐ দিনে তা দান করা বিদআত।

বলাই বাহুল্য যে, উক্ত আমোদ করতে গিয়ে মুসলিমদের কত শত অর্থের অপচয় ঘটে। যে অর্থ সম্পর্কে কাল কিয়ামতে তাকে প্রশ্ন করা হবে।

পক্ষান্তরে এক সম্প্রদায়কে দেখা যায় যে, ফূর্তি ও ফুটানি করার জন্য তাদের পকেটে পয়সা নেই দেখে অমুসলিমদের পূজোর

চাঁদা তোলার অনুকরণে তারাও জোরপূর্বক পথে-বাজারে চাঁদি ফাটিয়ে চাঁদা তুলে বেড়ায়। যাতে তারা উভয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও ঘৃণিত হয়। দেশের আইনের কাছেও তারা হয় অপরাধী।

অমুসলিমরা হয়তো ধারণা করে যে, এটাও হল ইসলাম এবং এটাই হল মুসলমানদের প্রধান পর্ব! অথচ মুসলিমের ঘরে জন্ম নিয়ে তারা যে, কুলের কুলাঙ্গার তা তাদেরকে কে বুঝাবে? কে বুঝাবে যে, তাদের ঐ ইসলামে যদি ঐ শ্রেণীর আমোদ-ফূর্তি না থাকতো, তাহলে ভুলেও তারা সে কাজ করতো না। যেহেতু তারাই তো কোন মাদ্রাসার জন্য মুসলিমদের কাছে চাঁদা করতে দেখলে নাক সিঁটকায় এবং তারই জন্য মাদ্রাসার শিক্ষাকে 'ভিখেরী বিদ্যা' বলে অভিহিত করে।

আসলে বিজাতির দেখাদেখি আনন্দ লাভের মানসে ধর্মকে আনুষ্ঠানিকতার হৈচৈ-এ সীমাবদ্ধ করে ঐ শ্রেণীর লোকেরা এই ধরনের পরব পালন করে থাকে। আসলে হযরত হুসাইন বা তাঁর নানা (ﷺ)র প্রতি যতটা মহব্বত তারা প্রকাশ করে থাকে, তার থেকে আরো বেশী প্রকাশ করে থাকে আমোদ-ফূর্তির প্রতি তাদের প্রধান মহব্বত। সুতরাং আল্লাহ তাদেরকে সৎপথ দেখান। আমীন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বিদআতের এই ঘটা নবী বা সাহাবাদের যুগে ছিল না। ছিল না তাবেয়ীদের যুগে। রাজনৈতিক ফায়দা লুটার জন্য এই বিদআত সর্বপ্রথম চালু করে রাজা মুইযযুদ দাওলাহ (মুয়ীজুদ্দুল্লা) ফাতেমী বাগদাদে ৩৫২ হিজরীতে। আর ধীরে ধীরে ইরান-তুরান পার হয়ে তা উপমহাদেশে চালু হয় প্রায় ১৪১৪ খ্রিষ্টাব্দের পরে বাদশাহ তৈমুরলঙ্গের যুগে।

হুসাইন ﷺ মুহার্রাম ও আশূরাকে কেন্দ্র ক'রে কত শত বানাওয়াটি ও মনগড়া হাদীস ও ইতিহাস তৈরী হয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে একাধিক উপন্যাস ও কাব্য। আর সেই সব মনগড়া হাদীস ও উপন্যাসকে ভিত্তি ক'রে আমাদের যুবকরা আনুষ্ঠানিক ধর্ম পালন করতে আনন্দবোধ করছে।

প্রকাশ থাকে যে, 'বিষাদ-সিন্ধু' কোন ইতিহাসের বই নয়; বরং তা একটি উপন্যাস। সুতরাং সেই বই থেকে ইতিহাস গ্রহণ ক'রে তা বিশ্বাস করা আমাদের উচিত নয়।

আমাদের উচিত, নবী ﷺ ও তাঁর পরিবারের সকলের প্রতি প্রগাঢ় মহব্বত রাখা। তা না রাখলে আমাদের ঈমান থাকতে পারে না।

পক্ষান্তরে এই দিনে নিজ পরিবার-পরিজনের উপর খরচ বৃদ্ধি করা, ভালো খাবার খাওয়া, বিশেষ কোন নামায পড়া, দান-খয়রাত করা, বিশেষ ক'রে শরবত-পানি দান করা, কলপ ব্যবহার করা, তেল মাখা, সুরমা ব্যবহার করা প্রভৃতি বিদআত। এ সকল বিদআত হযরত হুসাইন ﷺ-এর খুনীরাই আবিষ্কার ক'রে গেছে। *(তামামুল মিন্নাহ ৪১২পৃঃ দ্রঃ)*

১০ই মুহার্রমের শহীদদেরকে স্মরণ ক'রে আনন্দ করে বা কেঁদে আর লাভ কি? আমরা জয়নাল আবেদীনের মত কেঁদে উম্মতের কি করতে পারি? আজ সারা বিশ্বে অনেক মুসলিম দেশই লহুতে লাল হচ্ছে। কবি বলেছেন,

"মুসলিম! তোরা আজ জয়নাল আবেদীন,
'ওয়া হোসেনা - ওয়া হোসেনা' কেঁদে তাই যাবে দিন!"

না, তা নয়। বরং আমাদের সেই কারবালার শিক্ষা নিয়ে কর্তব্য নির্ধারণ ক'রে সত্যের পথে সংগ্রাম করতে হবে। কবি বলেছেন,

"ফিরে এল আবার সেই মুহর্রম মাহিনা,
ত্যাগ চাহি মর্সিয়া ক্রন্দন চাহি না।
উষ্ণীষ কোরানের, হাতে তেগ আরবীর,
দুনিয়াতে নত নয় মুসলিম কারো শির।
তবে শোন ঐ শোন বাজে কোথা দামামা,
শমশের হাতে নাও, বাঁধো শিরে আমামা।
বেজেছে নাকাড়া, হাঁকে নকীবের তুর্য্য,
হুঁশিয়ার ইসলাম, ডুবে তবে সূর্য্য।"